পরিচ্ছেদ ৪৯
প্রবন্ধ

প্রবন্ধ এক প্রকার গদ্য রচনা। কোনো বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে প্রবন্ধ রচিত হয়। সব ধরনের প্রবন্ধকে অন্তত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা – বর্ণনামূলক প্রবন্ধ, চিন্তামূলক প্রবন্ধ ও ব্যক্তি অনুভূতিমূলক প্রবন্ধ। পরবর্তী নমুনা অংশের 'বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প' বা 'ভাষা আন্দোলন' প্রবন্ধকে বলা যায় বর্ণনামূলক প্রবন্ধ, 'সময়ানুবর্তিতা' বা 'মাদকাসক্তি' প্রবন্ধকে বলা যায় চিন্তামূলক প্রবন্ধ, এবং 'লঞ্চ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা' বা 'কোনো ঘটনার স্মৃতি' প্রবন্ধকে বলা যায় ব্যক্তি অনুভূতিমূলক প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক. ভূমিকা হলো প্রবন্ধের প্রবেশক অংশ। এটি সাধারণত এক অনুচ্ছেদের হয়। এই অংশে প্রায়ই মূল আলোচনার ইঙ্গিত থাকে।

খ. উপসংহার হলো প্রবন্ধের সমাপ্তি অংশ। প্রবন্ধের প্রকৃতি অনুযায়ী এখানে সাধারণত ফলাফল, সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি স্থান পায়।

গ. প্রবন্ধের মূল অংশ একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত হয়ে থাকে। অনুচ্ছেদগুলো যাতে সমরূপ থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। যুক্তি বা কালের অনুক্রম মনে রেখে অনুচ্ছেদগুলোর সমরূপতা ঠিক করা যেতে পারে।

ঘ. বিশেষভাবে বর্ণনামূলক ও চিন্তামূলক প্রবন্ধের বেলায় অনুচ্ছেদগুলোর আলাদা শিরোনাম থাকে। এগুলোর নাম অনুচ্ছেদ-শিরোনাম। এসব শিরোনামের পরে কোলন যতি (:) দিয়ে লেখা শুরু করা যায়।

ঙ. প্রবন্ধের ভাষা হওয়া উচিত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

চ. প্রবন্ধের প্রতিটি অনুচ্ছেদ লেখার সময়ে প্রবন্ধের শিরোনামের কথা মনে রাখতে হয়, তাতে প্রবন্ধের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রবেশ করতে পারে না।

ছ. উদ্ধৃতি ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত। অপরিহার্য না হলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা ঠিক নয়। বিশেষভাবে বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে অন্য কোনো ভাষার উদ্ধৃতি বর্জনীয়।

জ. প্রবন্ধের নির্দিষ্ট কোনো আয়তন নেই। এমনকি এর অনুচ্ছেদসংখ্যাও নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা কমবেশি এক হাজার হতে পারে।

প্রবন্ধের কয়েকটি নমুনা নিচে দেখানো হলো।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

ভূমিকা: মানুষ ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। এই পছন্দকে কাজে লাগিয়ে ভ্রমণ-বান্ধব এক ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যার নাম পর্যটন শিল্প। এই শিল্পের কাজ হলো কোনো অঞ্চলের দর্শনীয় স্থানগুলোর তথ্য ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে তুলে ধরা, ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করা এবং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা। বাংলাদেশের একাধিক বনাঞ্চল, পাহাড়-নদী-ঝরনা, শস্যশোভিত মাঠ ও সবুজ প্রকৃতি, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র-সৈকত, নান্দনিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ও নিদর্শন প্রভৃতি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

তাই বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। এগুলোর টানে বিপুল সংখ্যক বিদেশি পর্যটকের বাংলাদেশে আসার সুযোগ রয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন-কেন্দ্রসমূহের দিকে তাকানো যাক।

সুন্দরবন: বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের অধিক জায়গা জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও বরগুনা জেলায় এর অবস্থান। সুন্দরী বৃক্ষ, গোলপাতাসহ নানা জাতের উদ্ভিদ এবং চিত্রল হরিণ, বাঘ, বানর, হনুমানসহ নানা জাতের পশুপাখির আবাস এই সুন্দরবন। অভ্যন্তরে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খালে রয়েছে কুমির। রোমাঞ্চপ্রিয় পর্যটকগণ নৌযানে করে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যেতে পারেন। ভয় ও ভালো-লাগার অপূর্ব মিশেলের কারণে সুন্দরবন ভ্রমণ যে-কোনো পর্যটকের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে থাকে।

সিলেটের রাতারগুল: সিলেট জেলার গোয়াইনঘাটে অবস্থিত রাতারগুল জলাবন বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির বন। এর আয়তন ৩ হাজার ৩২৫ একর। ১০ ফুট গভীর পানির উপর বনের গাছপালা জেগে থাকে। বর্ষাকালে পানির গভীরতা হয় ২০-৩০ ফুট পর্যন্ত। পর্যটকগণকে নৌকায় করে বনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এখানে উপভোগ করার মতো আছে কদম, হিজল, অর্জুন, ছাতিম প্রভৃতি গাছের সৌন্দর্য। বেড়াতে বেড়াতে দেখা হয়ে যায় বানর, বেজি, গুঁইসাপ, কিংবা সাদা বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি প্রভৃতি প্রাণী ও পাখির সঙ্গে।

সমুদ্র সৈকত: কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম (১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ) প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত। সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকরা ভিড় করেন কক্সবাজারে। সমুদ্র ছাড়াও কক্সবাজার জেলায় রয়েছে একাধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ধর্মীয় উপাসনালয় ও বুদ্ধ মূর্তি। স্থাপত্যশিল্পের বিচারে এগুলো অমূল্য। এছাড়া চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, কক্সবাজারের ইনানি, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, সুন্দরবনের কটকা প্রভৃতি সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণপিপাসুরা বেড়াতে যান। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে রয়েছে নারিকেল গাছ। দ্বীপ থেকে সমুদ্রের নীল জলরাশির সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং নানা রকমের প্রবাল দেখতে পর্যটকরা সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভ্রমণ করেন।

পার্বত্য অঞ্চল: বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ অর্থাৎ রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র। একদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মেঘ ছোঁয়ার আনন্দ, অন্যদিকে প্রাকৃতিক জলের উৎস ঝরনাধারা পর্যটকদের অভিভূত করে। রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে নৌকায় ভেসে বেড়ানো যায়। হ্রদের উপরে একটি সুদৃশ্য ঝুলন্ত সেতু রয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত আলুটিলা পাহাড়, রিসাং ঝরনা, মায়াবিনী লেক

প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের হাতছানি পর্যটকরা অগ্রাহ্য করতে পারে না। সিলেটের জাফলং-এর পিয়াইন নদীতে মনোমুগ্ধকর পাথুরে জলের ধারা, মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ড ঝরনা; হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও পঞ্চগড়ের চা বাগান; শ্রীমঙ্গলের ইকোপার্ক প্রভৃতি স্থান প্রায় সারাবছরই পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত থাকে। এ অঞ্চলসমূহে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের বর্ণিল জীবনাচারও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের একমাত্র পার্বত্য দ্বীপ মহেশখালী। বিখ্যাত আদিনাথ মন্দির ও বড়ো রাখাইনপাড়া বৌদ্ধ মন্দির এই দ্বীপেই অবস্থিত।

পুরাকীর্তি: বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। পুরান ঢাকার লালবাগে অবস্থিত মুঘল স্থাপত্য লালবাগ কেল্লা, বুড়িগঙ্গার তীরে নির্মিত আহসান মঞ্জিল, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও-এ গড়ে ওঠা অনুপম স্থাপত্য শৈলীবিশিষ্ট পানাম নগর, কুমিল্লায় আবিষ্কৃত প্রাচীন নগর ময়নামতী, বগুড়ার প্রাচীন পুরাকীর্তি মহাস্থানগড়, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার অন্তর্গত আড়াই হাজার বছর পূর্বের প্রত্ননিদর্শন সংবলিত উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রাম, নওগাঁ জেলায় আবিষ্কৃত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বৌদ্ধবিহার পাহাড়পুর, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্যকলার বহু নিদর্শন।

ঐতিহাসিক স্থাপনা: আরেক শ্রেণির স্থাপত্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল প্রাঙ্গণে স্থাপিত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদদের প্রতি নিবেদিত ও ঢাকার সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ, ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত জাতীয় জাদুঘর, ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ঢাকার মিরপুরে নির্মিত বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং এই উদ্যানে স্থাপিত স্বাধীনতা জাদুঘর ইতিহাসপ্রেমী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অবস্থা: পর্যটন বিশ্বব্যাপী একটি সম্ভবনাময় খাত। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের সম্মিলিত বার্ষিক ভ্রমণ-ব্যয় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এমন অনেক দেশ রয়েছে, যার প্রধান আয়ের উৎস পর্যটন। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প দিনে দিনে বিকাশ লাভ করছে। একদিকে বিদেশি পর্যটকদের আগমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলছে, অন্যদিকে দেশীয় পর্যটকদের ভ্রমণ সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি বছর ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ দেশীয় পর্যটক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে। এদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এই বিপুল সংখ্যক পর্যটক বিভিন্ন স্থানে চলাচল করায় পর্যটনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনীতি গতি লাভ করে। পরিবহণ, আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ, পোশাক, অলংকার প্রভৃতি ব্যবসায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে জড়িত। পর্যটনের বিকাশে অসংখ্য মানুষের জীবিকারও সংস্থান হয়। বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, পর্যটন শিল্প থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত জিডিপি অর্জন করা সম্ভব।

পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব: একটি দেশের পর্যটন শিল্প বিকশিত হলে সেই দেশের সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ হয়। পর্যটন এলাকায় অধিবাসীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। পর্যটকদের আগ্রহ রয়েছে এমন স্থান, স্থাপনা বা বিষয়ের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদেরও শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তারা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় তাগিদ অনুভব করে। এছাড়া পর্যটনের সূত্রে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মেলবন্ধন একটি মানবিক বিশ্ব তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

পর্যটন শিল্পের বিকাশে করণীয়: পৃথিবী ব্যাপী পর্যটন শিল্প এখন দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। বাংলাদেশে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর দিলে পর্যটন এলাকাগুলোতে পর্যটকদের যাতায়াত বাড়বে। প্রথমেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত যাতায়াত ব্যবস্থার দিকে। উন্নত পথ ও যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকলে পর্যটকরা নিরুৎসাহিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলসহ বেশকিছু পর্যটনকেন্দ্রে পৌঁছানোর সহজ পথ ও যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি। পর্যটকরা যাতে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে ভ্রমণ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অতিরিক্ত ভ্রমণ-ব্যয় পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করে। তাই, যাতায়াত এবং থাকা-খাওয়াসহ সংশ্লিষ্ট ব্যয় যাতে সীমার মধ্যে থাকে তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

উপসংহার: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থাপত্যকলা, স্থানীয় অধিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও সংস্কৃতি পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে পর্যটনকে একটি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ও স্থায়ী রূপ দিতে দরকার রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও এর প্রয়োগ। স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটনকেন্দ্রের অধিবাসীদেরও পর্যটকদের সহযোগিতায় সম্পৃক্ত করা উচিত। পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দেওয়া গেলে ভ্রমণের প্রতি তাদের উৎসাহ আরো বাড়বে। এর ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশের মানবিক সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিচয় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল হবে।

বাংলাদেশের উৎসব

ভূমিকা: উৎসব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মধ্যে নিহিত থাকে একটি জনপদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কিংবদন্তী এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস ও ভালো-মন্দ লাগার উপাদান। কোনো দেশ বা সমাজের উৎসব সম্পর্কে জানা থাকলে সেই দেশ বা সমাজের মানুষকেও অনেকখানি জানা হয়ে যায়। উৎসব হতে পারে কোনো জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক, আবার হতে পারে জনপদ বা ভূখণ্ডকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উৎসবের প্রচলন রয়েছে। তবে অধিকাংশ উৎসবই কোনো না কোনো ঋতু বা মাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এসব উৎসব মানুষের মনে কেবল আনন্দেরই সঞ্চার করে না বরং এর মধ্য দিয়ে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি উৎসব সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

বাংলা বর্ষবরণ: বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সর্বজনীন উৎসব বাংলা বর্ষবরণ। পুরানো দিনের দুঃখ, ব্যথা, ক্লান্তি, গ্লানি ভুলে নতুনকে বরণ করে নেওয়ার উৎসব এটি। এই উৎসব বাংলাদেশের সর্বত্র পালিত হয়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষ এই উৎসব পালন করে। এ উপলক্ষে মেলা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ব্যবসায়ীরা এই দিনে হালখাতা নামে হিসাবের নতুন খাতা খোলেন এবং বকেয়া আদায় উপলক্ষে গ্রাহকদের নিমন্ত্রণ করে মিষ্টিমুখ করান। বৈশাখের প্রথম দিনটিতে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে সামর্থ্য অনুযায়ী মজাদার খাবারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক আড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয় বাংলা নববর্ষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বের করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। নতুন বছরের সূর্যোদয়ের মুহূর্তে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বৈসাবি: বাংলাদেশে তিনটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বর্ষবরণ উৎসব 'বৈসাবি'। শব্দটি বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু – এই তিন নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত। বৈসু, সাংগ্রাই ও বিজু যথাক্রমে ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমাদের বর্ষবরণ উৎসব। সাধারণত বছরের শেষ দুই দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বৈসাবি উদ্‌যাপিত হয়।

নবান্ন: নবান্ন হলো নতুন ধানের উৎসব। হেমন্ত কালে ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে। এ সময়ে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে।

একুশে ফেব্রুয়ারি: একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির দীর্ঘ দিনের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ইতিহাস। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিলকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। তাদের উপর তৎকালীন সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালায়। এতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। এই আত্মত্যাগ এবং দীর্ঘ সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৫৪ সালে বাংলা পায় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি। শহিদদের স্মৃতিকে স্মরণ করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে পরের বছর থেকেই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ, শহিদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে দিবসটি পালিত হয়। শহিদদের আত্মদান ও পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আর্বিভাব ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দিনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। অফিসে, বাড়িতে, সড়কে, যানবাহনে সর্বত্র বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভা পায়। এদিন জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ সারা দেশের স্মৃতিসৌধগুলোতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। একই সঙ্গে শিশুকিশোরসহ বিভিন্ন বাহিনীর কুচকাওয়াজ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

বিজয় দিবস: ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় অর্জন করে। দিনটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের। তাই ডিসেম্বর এলেই সমগ্র দেশ লাল-সবুজে সেজে ওঠে। ১৬ই ডিসেম্বর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ সারা দেশের স্মৃতিসৌধগুলোতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উৎসব, ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও বই মেলার আয়োজন করা হয়।

বইমেলা: বইমেলা বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বইমেলা – ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা। এই বইমেলা পরিণত হয় পাঠক ও লেখকের মিলনমেলায়। বইমেলায় অনেক লেখক তাঁদের নতুন বই যেমন প্রকাশ করেন, তেমনি পূর্বে প্রকাশিত বইও মেলায় পাওয়া যায়। বইমেলা এখন আর কেবল বই কেনাবেচার মেলা নয়, এটি পরিণত হয়েছে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক উৎসবে।

ঈদ: ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব। ঈদ মানে আনন্দ, খুশি। ঈদ আসে আনন্দ আর মিলনের বার্তা নিয়ে। এই দিনে ধনী-নির্ধন ভেদাভেদ ভুলে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেয়। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে সাড়ম্বরে ঈদ উৎসব পালিত হয়। বছরে দুটি ঈদ। প্রথমে আসে ঈদ-উল ফিতর এবং পরে ঈদ-উল আজহা। রমজান মাসের শেষে হিজরি শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে ঈদ-উল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়। জিলহজ মাসের দশম দিনে পালিত হয় ঈদ-উল আজহা। ঈদ-উল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। একে বলা হয় আত্মত্যাগের ঈদ। দুটি ঈদেই মুসলমানরা নতুন পোশাক পরে, ধনীরা গরিবদের দান করে। ঈদগাহে ঈদের নামাজের আয়োজন করা হয়। নামাজের পর একে অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি করে। বাড়িতে ভালো খাবারের আয়োজন করা হয়। নিজে খেয়ে এবং অন্যকে খাইয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়।

দুর্গা পূজা: হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পুজা। শরৎকালে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তমী অষ্টমী নবমী এই তিন দিন দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সপ্তমীর আগের দিন ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন অনুষ্ঠান হয়। নবমীর পরদিন দশমীর উৎসবকে বলা হয় বিজয়া দশমী। বোধন থেকে বিসর্জনের দিনগুলো বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকে আন্দোলিত করে। পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয় পূজা মণ্ডপ, থাকে প্রসাদের আয়োজন। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় মেলা। দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আনন্দ নিয়ে পূজামণ্ডপে ঘুরতে যায়। অষ্টমীর দিন আনন্দ আর জাঁকজমক থাকে বেশি। রাতে হয় আরতি। দশমীর দিন দেবী-বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

বুদ্ধ পূর্ণিমা: বুদ্ধ পুর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদ্‌যাপিত হয় বলে এর অন্য নাম বৈশাখী পূর্ণিমা। এই দিনের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, তিরোধান ও বোধিলাভের স্মৃতি জড়িত। প্রার্থনা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে এবং ফানুশ উড়িয়ে এই উৎসব পালন করা হয়।

বড়ো দিন: বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা পালন করে বড়ো দিন। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে তারা এ উৎসব পালন করে। প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর বড়ো দিনের উৎসব পালিত হয়। গির্জায় প্রার্থনা করে, কেক কেটে, চকলেট বিতরণ করে, গান গেয়ে এই উৎসব পালন করা হয়।

অন্যান্য উৎসব: এছাড়া সারা বছরই বাংলাদেশে কোনো না কোনো উৎসব পালিত হয়। যেমন: রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, লালন-উৎসব, মধুমেলা, মহররম, ঈদ-ই মিলাদুন নবি, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, প্রবারণা পূর্ণিমা, ইস্টার সানডে ইত্যাদি।

উপসংহার: মানুষের জীবনে উৎসবের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। উৎসব মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী গড়ে তোলে। আনন্দমুখর উৎসব-প্রাঙ্গণে ঘুচে যায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। উৎসব ছাড়া সকল শ্রেণির মানুষের মিলনমেলার চিত্র কল্পনাই করা যায় না। জাতীয় উৎসবগুলো মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করে। উৎসবের মধ্যে যে মূল্যবোধের বীজ আছে তাকে জাগ্রত করতে পারলে নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন রক্ষা পাবে, তেমনি মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে প্রীতি ও সৌহার্দ্য।

জগদীশচন্দ্র বসু

ভূমিকা: যাঁদের অবদানে আধুনিক বিজ্ঞান এমন উৎকর্ষের শীর্ষে আরোহণ করেছে, তাঁদের মধ্যে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর নাম সর্বজনস্বীকৃত। উপমহাদেশে তিনি ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া বিজ্ঞানী। বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ প্রযুক্তির যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, তার পিছনে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান ছিল প্রারম্ভিক। তিনিই প্রথম বিনা তারে শব্দ প্রেরণের প্রযুক্তি বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, এই ধারণা আবিষ্কার করে তিনি পৃথিবীর পরিবেশবিদ্যাতেও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার অহংকার।

জন্ম ও বাল্যকাল: জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষ বাস করতেন মুন্সীগঞ্জ জেলার রাড়িখাল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম ভগবানচন্দ্র বসু। তিনি পেশায় ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জগদীশের লেখাপড়া শুরু হয় ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে। পরে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৮৮০ সালে বিএ পাশ করার পর তিনি ইংল্যান্ডে যান। এরপর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৮৫ সালে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন।

অধ্যাপনা জীবন: প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর অধ্যাপনা জীবন খুব সুখের ছিল না। নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। যেমন এখানে ব্রিটিশ ও দেশীয় অধ্যাপকদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এর প্রতিবাদে তিনি এক নাগাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বেতন গ্রহণ করেননি। এখানে গবেষণার করার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। ছোটো একটি কক্ষকে গবেষণাগার বানিয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি তাঁর গবেষণার কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

পদার্থবিদ্যায় অবদান: পদার্থবিদ্যায় গবেষণায় জগদীশচন্দ্র বসুর মৌলিক আবিষ্কার হলো, বিনা তারে রেডিও সংকেত পাঠানোর যন্ত্র তৈরি করা। সে সময়ে তারের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শব্দ পাঠানো যেত। ১৮৯৫ সালে তিনি প্রথমবারের মতো বিনা তারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শব্দ পাঠাতে সক্ষম হন। মাইক্রোওয়েভ গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান আছে। তিনিই প্রথম বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি রেডিও সংকেতকে শনাক্তকরণের জন্য অর্ধপরিবাহী জংশন ব্যবহার করেন। এই আবিষ্কার পেটেন্ট করে বাণিজ্যিক সুবিধা নেওয়ার বদৌলতে তিনি সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এসব অবদানের কারণে প্রযুক্তি-পেশাজীবীদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং' তাঁকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত করেছে।

জীববিজ্ঞানে অবদান: উদ্ভিদবিদ্যাতেও জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান অনন্য। তিনি উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। উদ্ভিদের সূক্ষ্ম নড়াচড়া শনাক্ত করা এবং বিভিন্ন উদ্দীপকে উদ্ভিদের সাড়া দেওয়া ইত্যাদি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। আবিষ্কার করেন উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ নামক যন্ত্র। উদ্দীপকের প্রতি উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার প্রকৃতি যে বৈদ্যুতিক, সেটিও তিনি প্রমাণ করেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য কৃতিত্ব: ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনের উপার্জিত সমস্ত অর্থ তিনি এই গবেষণাগার নির্মাণ করতে ও এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে ব্যয় করেন। বাংলা ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক হিসেবেও জগদীশচন্দ্র বসুর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'অব্যক্ত'।

উপসংহার: ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন। পরাধীন দেশে বাস করেও আজীবন তিনি যে মৌলিক সাধনা করেছেন, তা এখন সমগ্র বিশ্বের অহংকার। আর্থিকভাবে তিনি যথেষ্ট সচ্ছল ছিলেন না; তা সত্ত্বেও তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার উৎস।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ভূমিকা: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে বলা হয় বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায়। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন বাঙালি মুসলমান সমাজ, বিশেষত নারীসমাজ শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। তখন পর্দাপ্রথার কঠোর শাসনে নারীসমাজ ছিল অবরোধবাসিনী। রোকেয়া পিছিয়ে পড়া সমাজের এই বৃহত্তর অংশকে শিক্ষা ও কর্মের আলোয় আলোকিত করতে নিজের জীবনকে নিবেদন করেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে নারী আজ শিক্ষাদীক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে, আদালতে সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

রোকেয়ার পরিবার ও সমাজ: রোকেয়ার পারিবারিক নাম রোকেয়া খাতুন। তাঁর পিতা জহির উদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী সাবের ছিলেন একজন জমিদার। তাঁর মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী। রোকেয়ার দুই বোন করিমুন্নেসা ও হুমায়রা; তাঁর বড়ো দুই ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান সাবের। পারিবারিক প্রথা অনুসারে পাঁচ বছর বয়স থেকে পর্দার কঠোরতার মধ্যে রোকেয়াকে শৈশবকাল অতিবাহিত করতে হয়। শৈশবে আরবি-ফারসি-উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও রোকেয়ার পিতা বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ঘরের বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ মেয়েদের ছিল না। কিন্তু মেধাবী রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ।

পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি একজন ইংরেজ মেমের কাছে কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বোনের এই বিদ্যানুরাগ দেখে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষিত ভাই ইব্রাহিম সাবের ইংরেজি শেখান রোকেয়াকে। পিতার কঠোর নজর এড়িয়ে রোকেয়া বড়ো দুই ভাই-বোনের সহযোগিতায় বাংলা-ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহী ও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বোন করিমুন্নেসার অনুপ্রেরণায় রোকেয়া বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি একইসঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করেন। ১৮৯৮ সালে বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিবাহ হয়। স্বামীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা আর. এস. হোসেন নামে পরিচিত হন। স্বামীর ঐকান্তিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় রোকেয়া পড়াশোনা ও সাহিত্যচর্চা অব্যহত রাখেন। ১৯০৯ সালে তাঁর স্বামীর জীবনাবসান ঘটে।

নারীশিক্ষা বিস্তার: বাংলার মুসলমান সমাজে রোকেয়া দুই ভাবে অবদান রাখেন। প্রথমত, শিক্ষাবিস্তারে এবং দ্বিতীয়ত, সাহিত্য সৃষ্টিতে। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে রোকেয়া তাঁর স্বামীর স্মরণে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে তাঁর নারীশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯১১ সালে কলকাতায় স্কুলটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রোকেয়া মুসলমান নারীদের সামনে আধুনিক শিক্ষার দরজা খুলে দেন। স্কুলটিতে ধীরে ধীরে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়। রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য কেবল স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেননি, ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন। মেয়েদের স্কুলে নেওয়ার জন্য পৃথক গাড়িরও ব্যবস্থা করেন তিনি। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্যে অবদান: বাংলা সাহিত্যে রোকেয়ার আনুষ্ঠানিক পদার্পণ ঘটে ১৯০২ সালে কলকাতার 'নবপ্রভা' পত্রিকায় 'পিপাসা' নামক রচনা প্রকাশের মাধ্যমে। এরপর 'নবনূর', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতে থাকেন। তাঁর লেখনী তৎকালীন মুসলিম সমাজকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। রক্ষণশীল সমাজ তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। রোকেয়া তাঁর লেখায় যেমন নারীমুক্তির কথা বলেছেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ত্রুটিগুলোকে নির্দেশ করেছেন, একইভাবে নারীর মানসিক দাসত্বেরও সমালোচনা করেছেন। নারীর অলংকারকে রোকেয়া দাসত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রোকেয়া তাঁর নারীবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড (১৯০৪) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২২)। 'সুলতানাজ ড্রিম' (১৯০৮) তাঁর একটি ইংরেজি রচনা যা পরবর্তী কালে 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) ও 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১) তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। হাস্যরস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহয্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসম অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর সকল রচনাই নারীশিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন একজন সমাজসচেতন, সংস্কারমুক্ত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রগতিশীল লেখক ও সমাজকর্মী। রোকেয়া মনে করতেন, পড়তে লিখতে পারাই নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো নারীকে তার অধিকার লাভে সক্ষম করে তোলা। প্রকৃত শিক্ষা একজন নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। নারীরা যাতে অন্যের গলগ্রহ হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য না হয়, সে-বিষয়ে তিনি নারীদের সচেতন করতে সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যান। শিক্ষাগ্রহণে নারীর সচেনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা 'মুসলিম নারীদের সমিতি' গড়ে তোলেন। মুসলিম নারী সমাজকে সংগঠিত করতে 'নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি', 'বেগম উইমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্স', 'নারীতীর্থ সংস্থা' প্রভৃতি সংগঠনে যোগ দেন এবং নারীর উন্নয়নে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী ধারণ করেন। নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পুরুষের বহুবিবাহ, নারীদের বাল্যবিবাহ এবং পুরুষের একতরফা তালাক প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। রোকেয়ার এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ হয়।

উপসংহার: সমাজ ও নারী কল্যাণ সাধনে রোকেয়ার অবদান অনস্বীকার্য। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রসরতার পেছনে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু নারীকে পিছনে রেখে সমাজের সার্বিক অগ্রগতি যে সম্ভব নয়, তা রোকেয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই রোকেয়ার সংগ্রাম ছিল পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা।

লঞ্চ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

ধান, নদী ও খালের জন্য বিখ্যাত বরিশাল। সেই বরিশালে যাওয়ার একটি সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাও আবার লঞ্চে! ছোটো খালার শ্বশুরবাড়ি বরিশালে। গত মাসে যখন তাঁরা সপরিবার সেখানে যাচ্ছিলেন, আমাকেও যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করলেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। কারণ, বাসে, ট্রেনে, এমনকি নৌকায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে; কিন্তু লঞ্চে ভ্রমণের সুযোগ হয়নি। খালাতো ভাই রাজীবের মুখে লঞ্চ ভ্রমণের মজার মজার অনেক কথা শুনেছি। তাই আমি রাজি হতে মোটেও দেরি করিনি।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আমরা সদরঘাটে পৌঁছলাম। ঘাটের টিকিট কিনে প্রবেশ করলাম জেটিতে। দেখলাম প্রকাণ্ড সব লঞ্চ জেটির সঙ্গে বাঁধা। প্রত্যেক অঞ্চলের লঞ্চ আলাদা আলাদা করে রাখা। কর্মচারীরা নিজ নিজ লঞ্চে ওঠার জন্য যাত্রীদের জোর গলায় ডেকে চলেছে। জেটিতে প্রচুর মানুষ। নানা গন্তব্যের যাত্রীরা নিজেদের লঞ্চটি খুঁজে নিচ্ছে। কেউ একা, কারো সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা। হকাররা তাদের পণ্য সাজিয়ে যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। হকাররা শুধু জেটিতেই নয়, নৌকায় করেও বিক্রি করছে তাদের জিনিসপত্র। নদীর ওপার থেকে ছোটো ছোটো নৌকায় যাত্রীরা এপারে আসছে।

প্রত্যেকটি লঞ্চই উজ্জ্বল আলোয় সজ্জিত। আমরা বড়ো একটি লঞ্চে উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নির্ধারিত স্থানে ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস রাখলাম। লঞ্চটি ৪ তলাবিশিষ্ট। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এর

দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ মিটার। বেশ কৌতূহল নিয়ে লঞ্চটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দোতলা ও তিন তলায় সারবাঁধা বিলাসবহুল কক্ষ। নিচতলার পুরোটাই ডেক। নিচতলার ডেকের মেঝেতে যাত্রীরা চাদর বিছিয়ে নিজের শোয়ার ব্যবস্থা করছে। লঞ্চের পিছন দিকে ইঞ্জিনরুম, রেস্তোরাঁ ও একটি চায়ের দোকান। জানা গেল জরুরি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টহল দিচ্ছে আনসার সদস্যরা।

রাত ৯টার দিকে লঞ্চ বরিশালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যদিও লঞ্চ ছাড়ার সময় ছিল সাড়ে আটটা। ধীরে ধীরে জেটির মানুষগুলো ছোটো হতে হতে ঝাপসা হয়ে গেল। আমরা ঘাট থেকে অনেক দূরে চলে এলাম। লঞ্চের সারেং একটু পরপর সাইরেন বাজাচ্ছেন আর সার্চলাইট ফেলে পথটা দেখে নিচ্ছেন। অনেকক্ষণ চলার পর একটি বড়ো নদী দেখতে পেলাম। তীর দেখা যায় না। নদীটির নাম শুনলাম মেঘনা। এটি বাংলাদেশের গভীরতম ও প্রশস্ততম নদী। রেলিং ধরে দাঁড়ালে যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোটো ছোটো আলোকবিন্দু চোখে পড়ে। খালা জানালেন ওগুলো মাছধরা নৌকা। নৌকাগুলো দেখে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরপর একটি দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভটভট আওয়াজ তুলে উল্টো দিকে যাচ্ছে কিংবা আমাদের লঞ্চ সেগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশের তারকারাজি আর নদীতে ভেসে থাকা আলোকবিন্দুগুলো অপরূপ দৃশ্য তৈরি করেছে। একসময় রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। লঞ্চে রান্না করে ইলিশ মাছ ভাজা আর ডাল দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। খাওয়া শেষে বসলাম কেবিনের সামনে চেয়ারে। সবাই মিলে রাতের নীরব সৌন্দর্য উপভোগ করছি আর গল্প করছি।

ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। যাত্রীদের কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে আবার কেউ কেউ আড্ডা দিচ্ছে। ডেকে হকার তেমন দেখা যাচ্ছিল না। খালামণি বরিশালের বিখ্যাত ব্যক্তিদের গল্প শোনাচ্ছেন। রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী অশ্বিনীকুমার দত্ত, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর, 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা বিজয় গুপ্ত, কুসুমকুমারী দাশ ও তাঁর পুত্র জীবনানন্দ দাশ, সুফিয়া কামাল, কামিনী রায়, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানের রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এবং গানটির সুরকার আলতাফ মাহমুদসহ আরো অনেকের কথা জানলাম যাঁরা এই বরিশালেরই মানুষ। প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের শহরে যাচ্ছি ভেবে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। হঠাৎ নৌপুলিশের একটি স্পিডবোট গতি কমিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অবৈধ মালামাল পরিবহণ রোধে এই অন্ধকার রাতেও তারা টহল দিচ্ছে। দূরে আরো কয়েকটি লঞ্চ দেখা যাচ্ছে। সারেং মাঝে মাঝে সাইরেন বাজাচ্ছে। একটু পরপরই সার্চলাইট ফেলে পথ দেখে নিচ্ছে। সারেঙের কক্ষে গিয়ে দেখলাম কত রকমের প্রযুক্তি তারা ব্যবহার করছে – রাডার, কম্পাস, জিপিএস ইত্যাদি।

হয়তো প্রথমবার লঞ্চে চড়ছি বলে উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না। তবুও খালামণির কথায় শুয়ে পড়লাম। ভোর পাঁচটার দিকে খালামণি ডেকে তুললেন – 'এই তোরা ওঠ! আমরা বরিশালে পৌঁছে গিয়েছি।' হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। দেখলাম ঘাটে আরো কয়েকটি লঞ্চ বাঁধা। যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। ভিড় কমলে আমরাও ব্যাগগুলো নিয়ে নেমে পড়লাম। গত রাতটি আমার জীবনের স্মরণীয় একটি রাত হয়ে থাকবে। অসাধারণ একটি ভ্রমণের ভালো-লাগা নিয়ে আমরা পা ফেললাম জীবনানন্দের শহরে।

একটি ঝড়ের রাত

বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এসব অভিজ্ঞতার কোনোটি আনন্দদায়ক, কোনোটি রোমাঞ্চকর আবার কোনোটি প্রচণ্ড ভয়ের। যে ঘটনাগুলো মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়, আহত করে বা ভীতিবিহ্বল করে, মানুষ তা সহজে ভোলে না। একটি ঝড়ের রাত তেমনই আমার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আমি যখনই সে-রাতের কথা ভাবি, ভয়ে শিউরে উঠি। অন্ধকার রাত, ঝোড়ো বাতাসের গর্জন, সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি, হুড়মুড় করে চালা ঘরগুলোর ভেঙে পড়ার শব্দ, ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ – সবকিছু আমার মনে ছবির মতো ভেসে ওঠে।

সকাল থেকেই ঈশান কোণে মেঘ জমছিল। কালো কালো পুঞ্জীভূত মেঘে দুপুরের পরই দিনের আলো হারিয়ে গেল। বাতাসও যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। বেতার ও টেলিভিশনে বারবার বিপদ সংকেত জানানো হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা সবাইকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশনা দিচ্ছে। তা শুনে মানুষও দলে দলে আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে। আমাদের পাকা দেয়ালে টিনের চালার বাড়ি। তাই বাবা বললেন, এখানে আমরা নিরাপদে থাকবো।

সন্ধ্যা হতে হতে প্রকৃতি এক অপরিচিত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে আগেভাগেই বাড়ি ফেরে। মাঝিরা নিরাপদ স্থানে নৌকা বাঁধে। নদীর ধারে দেখা গেল বেশ কয়েকজন নারী চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে অস্পষ্ট জেলে-নৌকাগুলোর দিকে। প্রিয়জনের জন্য কাতর অপেক্ষা, পাখিদের ব্যস্ত হয়ে নীড়ে ফেরা, হাটুরেদের আতঙ্কিত পদক্ষেপ, থেকে থেকে গবাদি পশুর আর্তনাদ যেন আসন্ন বিপদের আভাস দিচ্ছিল। অল্পক্ষণেই অন্ধকারের চাদরে চারপাশটা ঢেকে গেল। বিদ্যুৎ চমকে আঙিনা থেকে দিগন্ত পর্যন্ত যেটুকু চোখে পড়ে, তার সবটাই আমার কাছে ভূতুড়ে লাগছিল।

সন্ধ্যার পর থেকে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। তা ঝড়ো বৃষ্টিতে রূপ নিতে সময় নিল না। দানবীয় শক্তি নিয়ে ঝড় আছড়ে পড়ল আমাদের লোকালয়ে। আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বাবা-মার গা-ঘেঁষে বসে আছি। হারিকেনের আবছা আলোয় পরিবেশটা আরো থমথমে। এর মধ্যে ঝড়োবৃষ্টির একটানা শব্দে কানে তালা লাগার মতো অবস্থা। বাবা বললেন, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চাল জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে বৃষ্টির পানি পড়তে আরম্ভ হলো। মনে হলো যে-কোনো সময়ে পুরো চালাটি আমাদের মাথার উপরে খসে পড়বে। বাবা আমাদের নিয়ে একটি মজবুত খাটের নিচে অবস্থান নিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পায়ের নিচে পানির প্রবাহ টের পেলাম। বুঝলাম দরজার নিচ দিয়ে ঘরে একটু একটু করে পানি ঢুকছে। তখনও পর্যন্ত বাবা খাটের নিচে থাকা নিরাপদ মনে করলেন। পাশের বাড়ি থেকে নারী-পুরুষের আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিল। বাবা চিৎকার করে তাদেরকে আমাদের ঘরে আসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই বিকট শব্দে কিছু একটা আছড়ে পড়লো বাড়ির একপাশে। বাতাসের প্রবল তোড়ে উড়ে গেল পিছনের বারান্দার চাল।

অল্পক্ষণ পরে প্রতিবেশীদের কয়েকজন কাকভেজা হয়ে হুড়মুড় করে আমাদের ঘরে ঢুকল। তাদের একজনের মাথায় আঘাত লেগেছে। বাবা দেরি না করে কী একটা ওষুধ মেখে লোকটির মাথা গামছা দিয়ে বেঁধে দিলেন। তাকে ধরে একটি নিরাপদ জায়গায় বসালেন। শুনলাম একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ উপড়ে গিয়ে তাদের ঘরের উপর পড়েছে। তারাই বললো, আমাদের গোয়ালঘরের চাল নাকি উড়ে গিয়েছে। গরুগুলোর কথা ভেবে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল।

এক সময়ে বাতাসের বেগ খানিকটা কমে আসে। তখনও থেকে থেকে ভয়ানক শব্দে বাজ পড়ছে। বাবা-মা আমাকে শুকনো কাপড় বের করে দিলেন। প্রতিবেশীদের জন্যও কাপড়, কিছু শুকনো খাবার ও পানির ব্যবস্থা করে তাদেরকে মোটামুটি স্বাভাবিক করলেন। বাবা আহত লোকটিকে বারবার পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সে আগের চেয়ে ভালো বোধ করছে। আরো কিছুক্ষণ পর ঝড় পুরোপুরি থেমে গেল। তবে সমস্ত রাতই আমরা বসে কাটালাম।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাবা দরজা-জানালা খুলে দিলেন। আমি বাইরে বেরিয়ে যা দেখলাম, এক কথায় তা অবিশ্বাস্য। বেশ কয়েকটি বড়ো গাছ উপড়ে পড়েছে। এখানে-সেখানে মৃত ও আহত পাখি পড়ে আছে। আমাদের ঘরের দুটি বারান্দার চাল উড়ে গেছে। অন্য একটি বাড়ির ঘরের চাল উড়ে এসে পড়েছে আমাদের উঠানে। গোয়ালঘরে ছুটে গিয়ে দেখি, এর চালা নেই – একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছড়ে পড়েছে সেখানে। আমাদের চারটি গরুর একটি বড়ো রকমের আঘাত পেয়েছে। কয়েক বাড়ি পরে কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গিয়ে দেখি, বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। রাস্তাঘাটের যে অবস্থা, তাতে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানোই কঠিন ব্যাপার। বাবা এবং আরো কয়েকজন যুবক মিলে একটি মাচা বানিয়ে লোকটিকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটলেন। আমি মাকে সাহায্য করতে গেলাম। মনে মনে বন্ধুদের কথা ভাবছি আর অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠছি।

সেদিনের রাতে ঝড়ের যে দানবীয় তাণ্ডব দেখলাম, তা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। ঝড় যেন তার প্রকাণ্ড গ্রাসে সবকিছু নিঃশেষ করতেই এসেছিল। ঘর, আঙিনা, বনবাদাড়, নদীর বাঁধ, মেঠো ও পাকা পথ – সর্বত্রই ধ্বংসলীলার ক্ষত। ওই রাতের পরে গ্রামবাসীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। আর মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছিল আরো বেশি।

কৃষি উদ্যোক্তা

ভূমিকা: অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং জনবল কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উপার্জনের প্রত্যাশায় যখন কোনো কাজ করার পরিকল্পনা করে, তখন তাকে উদ্যোগ বলে। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের বলে উদ্যোক্তা। প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। বিপুল জনসংখ্যা, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, বেকারত্ব – এ সবকিছুর ভিতরে একদল তরুণ কৃষিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছেন। শিক্ষিত তরুণদের কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা: কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কৃষক তাঁর পণ্য বাজারে বিক্রির চেয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোকে বেশি গুরুত্ব দেন অথবা কিছুটা বিক্রির জন্য এবং কিছুটা পরিবারের চাহিদা মেটাতে ব্যয় করেন। অন্যদিকে, একজন কৃষি উদ্যোক্তার মূল লক্ষ্য বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির হতে হয় এবং তার কাজে প্রচুর ঝুঁকি থাকে।

কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রসমূহ: শস্য, প্রাণীসম্পদসহ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়কে কৃষি উদ্যোগের আওতায় আনা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই মূলধন, জমির পরিমাণ, মাটির গুণাগুণ, অবকাঠামো, বালাই ব্যবস্থাপনা, লোকবল, পরিবহণ ব্যবস্থা, বাজার ও চাহিদা, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ধান, গম, ডাল, আখ, পাট, ঘাস, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা, মধু, মাশরুম, রেশম, মাছ প্রভৃতির চাষ ও উৎপাদন; গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণীসম্পদের লালন-পালন; গাছের চারা, জৈব সার, বায়োগ্যাস, দুধ ও দুধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কৃষি উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

কৃষি উদ্যোক্তার করণীয়: একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত করণীয় সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত:

ক. উদ্যোক্তাকে প্রথমেই তার পণ্যের বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে।

খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারণ, তাঁর এই উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

ঘ. কৃষিখাতে উদ্যোক্তাকে অনেক রকমের ঝুঁকি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।

ঙ. উদ্যোক্তা যে ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা জরুরি। উপযুক্ত খাবার, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সম্প্রতি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার উদ্যোক্তাদের সাফল্যে ভূমিকা রাখছে।

চ. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এতে বড়ো ধরনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে অংশীদার নির্বাচন করা উচিত।

ছ. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রমিক ও পণ্য পরিবহণ, বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের কথা চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ: কৃষির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন:

ক. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষির ধরন অনুযায়ী স্বল্প সুদে বিভিন্ন অঙ্কের ঋণ প্রদান করছে।

খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ. বছরব্যাপী চাষ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল শস্য ক্যালেন্ডার' ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' দেওয়া আছে, যা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল ফলাতে সাহায্য করে। ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষিসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানাতে 'কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিদ্রব্যাদির বাজারদর, কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ করে।

উপসংহার: একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য চূড়ান্ত বিচারে খাবারের চাহিদা মেটাবে।

ভাষা আন্দোলন

ভূমিকা: ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন, যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীর আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল আরো আগে, অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত বিচারে ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে, অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। এটি একইসঙ্গে ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের বীজমন্ত্র।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়: ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ – পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা) ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠে তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এর কিছু দিন পরে ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এক ভাষণে ঘোষণা করেন: 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদে তারা বলে, উর্দু নয় বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যেও গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার সম-মর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়: ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৯শে জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরে প্রতিবাদী মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে দিনটিতে ঢাকা শহরে সকল প্রকার মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি: ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আরো অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে। শহিদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী আন্দোলন: ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রা সহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে ওইদিন বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্ররা নির্মাণ করে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন বাইশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

ভাষা আন্দোলনের অর্জন: ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ভাষাকেন্দ্রিক হলেও তা পুরো বাঙালি জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। একুশের চেতনাকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল ২১ দফা সংবলিত। ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলন-ভিত্তিক সাহিত্য : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন গতি লাভ করে। রচিত হয় ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক অনেক কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। একই বছর মুনীর চৌধুরী কারাগারে বসে 'কবর' নাটক রচনা করেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লেখেন গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী; শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন 'মাগো, ওরা বলে' কবিতা। জহির রায়হান একুশকে নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯)। এছাড়া ওই সময়পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্য চর্চার অন্যতম অনুপ্রেরণা।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এই যে, বাঙালি জাতি তার জাতীয়তাবোধ ও অধিকার সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। ভাষার প্রশ্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরপর যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল স্মৃতি। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখনও সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপসংহার: একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় নির্দেশক দিন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বীর ভাষা-শহিদদের অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তবে তাঁদের আত্মদান তখনই সার্থক হবে, যখন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা: মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ও রক্তাক্ত অধ্যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ। স্বাধীনতা হলো একটি জাতির আজন্ম লালিত স্বপ্ন। স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার মধ্যে যেমন গৌরব থাকে, তেমনি পরাধীনতায় থাকে গ্লানি। আর তাই পরাধীন হয়ে কেউ বাঁচতে চায় না। দাসত্বের শৃঙ্খলে কেউ বাঁধা পড়তে চায় না। বাঙালি জাতিও চায়নি বছরের পর বছর ধরে শাসনে-শোষণে পাকিস্তানিদের দাস হয়ে থাকতে। তাই তারা শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিল আন্দোলনে, সোচ্চার হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পেয়েছিল তাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা।

পটভূমি: ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুইটি পৃথক রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল দুটি অংশ – পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে সমান মর্যাদা দেয়নি। বরং সব সময় চেয়েছে পূর্ব পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখতে। পশ্চিম পাকিস্তান সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানকে। শিল্প কারখানার কাঁচামালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান নির্ভর করতো পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। শ্রমিকদের অল্প বেতন দিয়ে উৎপাদনের কাজ করাতো। রাজস্ব থেকে আয়, রপ্তানি আয় প্রভৃতির সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় যেখানে ৯৫% ব্যয় হতো, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় ব্যয় হতো মাত্র ৫ শতাংশ। আবার, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে জয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কোনোভাবেই বাঙালিদের হাতে শাসনভার তুলে দিতে চায়নি। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়নে অবহেলা, মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপসহ সকল প্রকার বৈষম্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জোরালো করে তোলে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ: বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পূর্ব থেকে হলেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তা জোরালো হয়। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ওই দিন ভাষার দাবিতে রাজপথে শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে। ভাষা ও সংস্কৃতির উপর শাসকগোষ্ঠীর আঘাত ছিল বাঙালির কাছে তাদের অস্তিত্বের মূলে আঘাতস্বরূপ। একদিকে বাঙালিরা যেমন সংকটের প্রকৃতি ও গভীরতা বুঝতে পারে, অন্যদিকে তা মোকাবেলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৬২-র গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬-র বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি, ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় – এই প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটে এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

অপারেশন সার্চলাইট: ইতিহাসের ঘৃণিত গণহত্যা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের 'অপারেশন সার্চলাইট'। ওইদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় এবং ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে হত্যা করে অসংখ্য নিরস্ত্র বাঙালিকে। পরদিন থেকেই শুরু হয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম।

মুজিবনগর সরকার গঠন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এই দিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত সরকার ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। তখন থেকে এই জায়গার নতুন নাম হয় মুজিবনগর। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ চলতে থাকে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক পদক্ষেপ ছিল মুজিবনগর সরকার গঠন। এই সরকারের নেতৃত্বে নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন আদায়ে এই সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও জনযুদ্ধঃ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা সদস্যরা সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা ছাড় দেয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহিদ হন। মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঋণ কোনো দিন শোধ হওয়ার নয়। জাতি চিরকাল মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠসন্তান হিসেবে মনে রাখবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তাই এ যুদ্ধকে বলা হয় গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য পুরো দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ৩রা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় মিত্রবাহিনী যুক্ত হয়ে যৌথভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে। যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় হয়।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকাঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী সক্রিয় ছিল কখনও সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনোবা যুদ্ধক্ষেত্রের আড়ালে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা অসংখ্য।

অজানা-অচেনা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন বহু নারী। চরম দুঃসময়ে পাকিস্তানি হানাদারের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। অনেক সময়ে পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের কাছে নারীর মান-মর্যাদা হারাতে হয়েছে এবং প্রাণও দিতে হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের এই সাহসী ও অগ্রণী ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা অনেকে রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের অবদানঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে ছুটে গিয়েছেন। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা: যুদ্ধের সময়ে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ, মনোবল বৃদ্ধিসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পত্রপত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, আবৃত্তি, নাটক, কথিকা, জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চরমপত্র' ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে দাঁড়ায়। ভারত সে সময়ে এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দেয়। তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের বিরোধিতা করলেও সে দেশের জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গানের দল বিটল্‌স্‌-এর জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্কর 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর আয়োজন করেছিলেন। ফরাসি সাহিত্যিক আন্দ্রে মালরো, জাঁ পল সার্ত্রে-সহ অনেকেই তখন বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

উপসংহার: মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির অহংকার। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এনে দেয়। এই স্বাধীনতা ত্রিশ লক্ষ বীর শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত, লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া। তাই এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের নিবেদিতপ্রাণ হওয়া উচিত। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো যেমন জরুরি, তেমনি নাগরিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের যথার্থ অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব।

সময়ানুবর্তিতা

ভূমিকা: ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করাই সময়ানুবর্তিতা। জীবনে সফলতা বয়ে আনার জন্য যেসব গুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে সময়ানুবর্তিতা একটি। মানবজীবনের সকল অনুষঙ্গ সময় দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। অনন্তের দিকে প্রবহমান সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোকেই সময়ানুবর্তিতা বলে। একবার সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে, পুনরায় আর তা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই সময়কে গুরুত্ব দিয়ে নিজ নিজ জীবন গঠনে সকলকে ঐকান্তিক হতে হয়। সময়ের কাজ সময়ে করলে জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়।

সময়ের বৈশিষ্ট্য: প্রবহমানতা সময়ের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান তথা গতিময়। একই জলপ্রবাহে যেমন দুইবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনি একই সময়কে দুইবার পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না। নদীর জলপ্রবাহ ভাটির টানে চলে গেলেও আবার জোয়ারে ফিরে আসে। কিন্তু অতিবাহিত সময় আর ফিরে আসে না।

সঠিক সময়ে উপযুক্ত কাজটি না করতে পারলে, অসময়ে শতচেষ্টায়ও তা সার্থকভাবে করা যায় না। কথায় আছে, 'সময়ের এক ফোঁড় আর অসময়ের দশ ফোঁড়'।

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব: মহাকালের হিসেবে মানবজীবন অতি ক্ষুদ্র। এই স্বল্পায়ু জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। কেননা মহাকালের বিচারে মানুষ যে সময় পায়, তা অতি নগণ্য। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সর্বোত্তম ব্যবহারে কাজ করা উচিত। যে ব্যক্তি সময়কে গুরুত্ব দিয়ে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করে, সে কোনো ধরনের বিড়ম্বনায় পড়ে না। এক জীবনে মানুষ যে পরিমাণ কাজ করতে পারে, তার একটি সীমা আছে। তাই কোনো কাজ ফেলে না রেখে যথাসময়ে তা সম্পন্ন করা উচিত।

সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি: একজন সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। সময়ানুবর্তিতা মানুষকে কাজের গুরুত্ব শেখায়। বিবেচক ব্যক্তি সময়ের গুরুত্ব বোঝেন; তাই তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। যে সকল দার্শনিক, বিজ্ঞানী, লেখক ও শিল্পী পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছেন, ধারণা করা যায়, তাঁদের আরো অনেক গুণের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা একটি।

ছাত্রজীবনে সময়ানুবর্তিতা: একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে, তার অনেকখানি নির্ভর করে ছাত্রজীবনের উপর। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ ফসলের বীজ বপনের কাল। এ সময়ে সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পড়াশোনা, খেলাধুলাসহ যাবতীয় কাজ গুরুত্ব অনুযায়ী সময় মতো করার অভ্যাস ছাত্রজীবনেই গড়ে তুলতে হয়। সময়ের সদ্ব্যবহার যে করতে জানে না, সে কোনো কিছুতে কৃতকার্য হয় না। ব্যর্থতা তার পিছু ছাড়ে না।

জাতীয় জীবনে সময়ের মূল্য: জাতীয় জীবনে সময়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারকে প্রতি বছর জুন মাসে পরবর্তী বছরের করণীয় ঠিক করে বাজেট ঘোষণা করতে হয়। এই বাজেটে উল্লিখিত কর্মসূচি ও প্রকল্প যথাসময়ে শেষ করতে না পারলে সরকারকে চাপের মধ্যে পড়তে হয়। আবার যাবতীয় অঙ্গীকার যথাসময়ে শেষ করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের সুনাম হয়। আসলে একটি দেশের মানুষ সময় সম্পর্কে কতটা সচেতন, এর উপর নির্ভর করে সে দেশের অগ্রগতি। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি সময়নিষ্ঠ, সে জাতি তত বেশি উন্নত। আবার পরিশ্রমী হতে হলেও সময়নিষ্ঠ হওয়া দরকার।

সময়কে কাজে লাগানোর উপায়: কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখলে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত, লক্ষ্য স্থির করা। লক্ষ্যহীন মানুষ সময়ের অপচয় করে। দ্বিতীয়ত, করণীয়গুলোকে প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ করা এবং ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করা। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে কাজটি সবচেয়ে জরুরি, সেই কাজটিই করা উচিত। তৃতীয়ত, প্রতিটি কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারণ করা। এতে সময়ের অপচয় করার প্রবণতা কমে যায়। চতুর্থত, কী পরিমাণ সময় হাতে আছে, তা বুঝে কাজ করা। পঞ্চমত, আলস্য ও উদাসীনতা পরিহার করা।

সময়ানুবর্তিতা ও সাফল্য: যে ব্যক্তি সময়কে মূল্যায়ন করতে জানে না, সে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে না। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইলে সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে। পৃথিবীর সকল সফল মানুষের সাফল্যের রহস্য সময়ানুবর্তিতা। কোনো মানুষই গুণের আধার হয়ে জন্ম নেয় না। ক্রমাগত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। শৈশব থেকেই সময়ানুবর্তিতার চর্চা করা উচিত। সময়ের মূল্য বোঝাতে গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখেছেন –

আজ করব না করব কালি
এই ভাবে দিন গেল খালি।
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়।

উপসংহার: জীবন ছোটো, কিন্তু কাজের পরিধি ব্যাপক। তাই কম সময়ের মধ্যে মানুষকে নিজের চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করতে হলে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে কৃষক যথাসময়ে বীজ বপন করে না, সে কেমন করে পাকা ফসল ঘরে তুলবে? যে ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা করে না, সে কী করে কৃতকার্য হবে? কাজেই একথা মানতেই হবে যে, সময়কে অবহেলা করা ঠিক নয়। বরং উপযুক্ত পরিশ্রম ও সময়ানুবর্তিতা মেনে চললে জীবনের চলার পথ সুগম হবে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ক্রিকেটে বাংলাদেশ

ভূমিকা: ইংল্যান্ডের সীমা পেরিয়ে ক্রিকেট বহু আগেই বিশ্বের একটি জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনার শেষ নেই। দেশের সর্বত্রই ক্রিকেট এখন জনপ্রিয় খেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি মর্যাদাপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে।

বাংলাদেশে ক্রিকেট: উপমহাদেশে ক্রিকেটের আগমন হয় ইংরেজদের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক কালে। তখন ক্রিকেট ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ১৯৪৭-এর পর থেকে ঢাকা অঞ্চলেও ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুনভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড' (বিসিসিবি), বর্তমানে যা 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড' (বিসিবি) নামে পরিচিত।

বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ: বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থার সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয় বাংলাদেশ। ১৯৮৬ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে। এরপর ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয় এবং ফাইনালে কেনিয়াকে হারিয়ে জয়লাভ করে। জয়ের আনন্দ সমস্ত বাংলাদেশকে ছুঁয়ে যায়। কারণ, এই জয় বাংলাদেশের জন্য আরেকটি প্রাপ্তি এনে দেয় – বাংলাদেশের জাতীয় দল বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

বাংলাদেশ দল ১৯৯৮ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে কেনিয়াকে হারিয়ে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে জয়লাভ করে। ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। ২০০৫ সালে ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়েকে ৩–২ ম্যাচে হারিয়ে সিরিজ জয়লাভ করে। ২০১০ সালে নিউজিল্যান্ডকে ৪–০ ম্যাচে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করে। ২০১৫ সালে ভারতের বিপক্ষে ২–১ ব্যবধানে, পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩–০ ব্যবধানে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জয় করে। এই অভূতপূর্ব বিজয়ে বিশ্ব একটি নতুন ক্রিকেট পরাশক্তির আবির্ভাব লক্ষ করে। বাংলাদেশ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় বিশ্বের প্রতিটি ক্রিকেট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে জয়লাভ করেছে।

আইসিসি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ: ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ৬টি আসরে অংশ নেয়। আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নেয় দলটি। প্রথম বিশ্বকাপেই স্কটল্যান্ড ও পাকিস্তানকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করে বাংলাদেশ দল। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে সেরা আট-এ এবং ২০১৫ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে আশানুরূপ ফল না পেলেও এই খেলায় বড়ো বড়ো দলকে হারিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ দল নিজেদের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়।

টেস্ট খেলার মর্যাদা অর্জন: বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টেস্ট খেলুড়ে দলের মর্যাদা লাভ করে ২০০০ সালে। ওই বছর ১৩ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় বাংলাদেশ দলের। অভিষেক টেস্টেই আমিনুল ইসলাম বুলবুল ১৪৫ রান করেন, আর নাইমুর রহমান দুর্জয় পান ৬ উইকেট। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে হেরে যায় বাংলাদেশ। পরের বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিষেক টেস্টে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সেঞ্চুরি করেন মোহাম্মদ আশরাফুল। ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জয় পায় বাংলাদেশ।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশ: ২০০৫ সালে ৫০ ওভারের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও পাঁচ দিনের টেস্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয় ২০ ওভারের খেলা টি-টোয়েন্টি। এতে একটি দল সর্বোচ্চ ২০ ওভার ব্যাট করতে পারে। বাংলাদেশ ২০০৬ সাল থেকে টি-টোয়েন্টি খেলে আসছে।

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট: ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই ঢাকা ও চট্টগ্রামে ক্রিকেট লিগ শুরু হয়। ১৯৭৪–৭৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চালু হয়। এ সময় থেকে জেলা পর্যায়েও ক্রিকেট লিগ চলতে থাকে। ১৯৯৯ সালে দেশে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা চালু হয়। তবে ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যাত্রা করে, যা বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে একটি চমৎকার সংযোজন। ঘরোয়া ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা নতুন খেলোয়াড় তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ: একাধিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে সুনাম অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ টেস্ট খেলার যোগ্যতা অর্জনের আগেই আইসিসি নকআউট বিশ্বকাপ ১৯৯৮ আয়োজনের দায়িত্ব পায়। ২০১১ সালে বিশ্বকাপের দশম আসরের অন্যতম আয়োজকের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের ভার পড়ে বাংলাদেশের উপর। বাংলাদেশের সরকার, জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ক্রিকেট-বিশ্বে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়াম ও জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, বগুড়ার শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম, খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, সিলেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেট অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আরো কিছু স্টেডিয়াম রয়েছে।

বাংলাদেশে ক্রিকেটের প্রভাব: পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ক্রিকেট নিয়ে ব্যাপক উদ্দীপনা বিরাজ করে। ক্রিকেট মানুষের দেশপ্রেমকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই যখনই বাংলাদেশ দল অন্য কোনো দলের বিপক্ষে খেলতে নামে, সমস্ত বাংলাদেশ উন্মুখ হয়ে থাকে। ক্রিকেটের কারণে বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার বাংলাদেশের মানুষও পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে পারছে। ক্রিকেট একইসঙ্গে বিজ্ঞাপন-বাণিজ্য ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের জন্য ক্রিকেট আরেকটি সুফল বয়ে এনেছে, তা হলো – পর্যটনের বিকাশ। বিশ্বের নানা দেশ থেকে আগত খেলোয়াড়, ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যবৃন্দ এবং ভক্তকুল বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং পর্যটন এলাকাসমূহে ভ্রমণ করছে। এতে একদিকে বিশ্বময় বাংলাদেশের পর্যটন-স্থানের নাম ছড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি।

বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তাবোধের বিকাশেও ক্রিকেট খেলা ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খেলা শুরুর আগে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজতে শুনলে এ দেশীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হয়। তখন নিজের দেশের প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা জাগে। বিশেষভাবে বাংলাদেশের খেলোয়াড়গণ যখন বিশ্বখ্যাত কোনো দলকে পরাজিত করে, তখন যে আনন্দ হয়, তা দেশপ্রেমেরই আনন্দ।

উপসংহার: বাংলাদেশের মানুষ ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে। ক্রিকেটের সঙ্গে এ দেশের কোটি কোটি মানুষের আবেগ জড়িত। তাই বাংলাদেশের বিজয়ে গোটা দেশ যেমন বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়ে, আবার পরাজয়ে মুষড়ে পড়ে। তবে কোনো পরাজয়েই দেশবাসী খেলোয়াড়দের প্রতি আস্থা হারায় না। তাদের সমর্থন ও উৎসাহ দিয়ে যায়, যাতে পরবর্তী খেলায় খেলোয়াড়রা সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। ক্রিকেটের উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের উচিত নতুন খেলোয়াড় তৈরিতে ভূমিকা রাখা, উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রতি আরো যত্নবান হওয়া এবং ক্রিকেটবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের ফুটবল

ভূমিকা: ফুটবল বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় খেলা। কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বত্র ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এর প্রতি মানুষের আগ্রহের মাত্রা বোঝা যায় বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হলে। তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত দেশগুলোর পতাকা উড়তে দেখা যায়। অনেকের গায়ে দেখা যায় পছন্দের দলের জার্সি। ফুটবলের প্রতি এ দেশের মানুষের ভালোবাসা ক্রমে এই খেলার প্রতি তাদের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তুলছে।

আধুনিক ফুটবলের ইতিহাস: প্রতি দলে এগারো জন করে দুটি দলে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলতে হয়। একটি বায়ুপূর্ণ চামড়ার বলকে হাত ও বাহু ছাড়া শরীরের যে-কোনো অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের মধ্যে প্রবেশ করাতে হয়। পৃথিবীতে ফুটবল ধরনের বেশ কয়েকটি খেলা প্রচলিত আছে। যেমন, রাগবি অনেকটা ফুটবল খেলার মতো। তবে এখন ফুটবলের যে রূপটি দেখা যায়, তা ১৮৬৩ সালে প্রবর্তিত। মূলত এ সময়ে ইংল্যান্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং তারা ফুটবল খেলার কতগুলো নিয়ম জারি করে। এই নতুন নিয়মের ফুটবল খেলা দ্রুত অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য ইংল্যান্ডকে আধুনিক ফুটবলের জনক বলা হয়। ইংল্যান্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রবর্তিত হওয়ায় ফুটবলের আরেক নাম 'এসোসিয়েশন ফুটবল'। আমেরিকায় একে বলা হয় 'সসার' বা 'সকার'। এটিকে এসোসিয়েশন শব্দের বিকৃত রূপ বলে মনে করা হয়। রাগবি ফুটবল কেবল রাগবি নামে অধিক পরিচত হওয়ায় এসোসিয়েশন ফুটবল শুধু 'ফুটবল' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলাদেশে ফুটবল বলতে এসোসিয়েশন ফুটবলকেই বোঝায়।

ফুটবল বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে প্যারিসে গঠিত হয় ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ফিফা)। সংস্থাটি প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বকাপ আসরে শিরোপা অর্জন করে উরুগুয়ে। বর্তমানে ফিফার সদস্য সংখ্যা ২১১।

বাংলাদেশে ফুটবলের যাত্রা: ভারতীয় উপমহাদেশে ফুটবলের আগমন হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। ইংরেজ বণিক, খেলোয়াড় ও সৈনিকরা ফুটবল খেলত। মূলত তাদের মাধ্যমেই উপমহাদেশে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ফুটবল জনপ্রিয় হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ১৯৪৮ সাল থেকে সমগ্র পাকিস্তানে ফুটবলের মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় 'ঢাকা লিগ'। ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ারি ক্লাব, আবাহনী ক্রীড়াচক্র, শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র প্রভৃতি ক্লাব বাংলাদেশে লিগ খেলাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে ফুটবল একটি নতুন মাত্রায় আবির্ভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বিশ্বকে অবগত করতে তখন গঠিত হয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'। তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ১৬টি ম্যাচ খেলেছিল।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সালে ঢাকায় ফুটবল লিগ শুরু করে। ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হয় জাতীয় ফুটবল। এক বছর পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল থেকে যুব ফুটবল যাত্রা শুরু করে। ফেডারেশন কাপ শুরু হয় ১৯৮০ সাল থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলো চালু রয়েছে:

১. বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ: এটি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) কর্তৃক আয়োজিত একটি টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ শুরু হয় ২০০৭ সালে।
২. বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স লীগ: এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেণির ফুটবল লিগ। ২০১২ সালে এটি যাত্রা করে।
৩. ফেডারেশন কাপ: এটি বাংলাদেশের প্রিমিয়ার নকআউট প্রতিযোগিতা। ১৯৮০ সাল থেকে এটি আয়োজিত হয়।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন: বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজন, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা, জাতীয় দল গঠন ও নিয়ন্ত্রণ তথা ফুটবলের যাবতীয় উন্নয়নে কাজ করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। বাফুফে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দল ও বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলকে তত্ত্বাবধান করে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ফুটবল: বাফুফে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এএফসি (এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন), ১৯৭৬ সালে ফিফা (ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনালে ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) ও ১৯৯৭ সালে সাফ (সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন) বাংলাদেশকে সদস্য করে। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ১৯৭৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। ১৯৮০ সালে 'এএফসি এশিয়া কাপ' টুর্নামেন্টে এবং ১৯৮৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অংশ নেয়। ফুটবলে বাংলাদেশের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয় ২০০৩ সালে। ওই বছরই বাংলাদেশ প্রথম সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া ২০১৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন গোল্ডকাপ-এ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল কমিটি। বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সদস্য। ২০১০ সালের ২৯শে জানুয়ারি দলটি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন গেমস-এ নেপালের বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে। বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল ২০১০ সালের সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে কক্সবাজারে ভুটানের বিপক্ষে ৯–০ ব্যবধানে এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২–০ ব্যবধানে জয়লাভ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক নারী ফুটবল দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের মেয়েরা বড়ো ভূমিকা রাখছে। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মেয়েরা।

ফুটবল খেলার মাঠ: স্থানীয় মাঠ ছাড়াও বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উন্নত মানের ফুটবল মাঠ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ও বীর শ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, সিলেট জেলা স্টেডিয়াম, যশোরের শামসুল হুদা স্টেডিয়াম, রাজশাহী জেলা স্টেডিয়াম, শহিদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়াম, গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়াম, ফেনীর শহিদ সালাম স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ স্টেডিয়াম উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার: ফুটবল বিশ্বের জনপ্রিয়তম খেলা। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনেও ফুটবলের জনপ্রিয়তা কম নয়। তবে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য জাতীয় ফুটবল দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিয়ে আসতে পারেনি। এক সময়ে ঘরোয়া ফুটবল সারা বাংলাদেশে যে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে পারতো, তাও এখন আবেদন হারিয়েছে। বয়সভিত্তিক ফুটবল দলগুলো মাঝে মাঝে যে সাফল্য দেখাচ্ছে, তা আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ফুটবলে গৌরব ফিরিয়ে আনতে দরকার কার্যকর নীতিমালা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায়ও সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের সন্ধান অব্যাহত রাখা উচিত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান

ভূমিকা: বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের নাম প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে আরামদায়ক। কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা লক্ষণীয়। অসংখ্য কৃষি প্রযুক্তি কৃষিকাজকে করে তুলেছে সহজসাধ্য। অজস্র উচ্চফলনশীল জাতের ফসল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কৃষিপণ্যও হয়েছে সহজলভ্য।

কৃষির অতীত-কথা: কৃষি হলো মানব সভ্যতার আদিম পেশা। জীবন ধারণের তাগিদে আদিম মানুষ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ফলমূল গুহায় নিয়ে আসতো এবং বনজঙ্গলের পশু-পাখি শিকার করতো। প্রকৃতির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীলতার কারণে প্রায়ই তাদের খাদ্য-সংকটে পড়তে হতো। বছরের কিছু সময়ে তাদের কোনো খাবার জুটত না। ফলে খাদ্যের সন্ধানে তাদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আদিম মানুষ এক পর্যায়ে পশুপালন ও বীজ বপন করতে শেখে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয় এবং জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিশ্চিন্ত। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত কৃষিকাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

কৃষি ও বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের অবদানে ধীরে ধীরে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। কৃষিকাজকে সহজ ও কম শ্রমসাধ্য করতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করছেন। ফলে একদিকে যেমন চাষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে, ফসল নির্বাচন ও নতুন নতুন ফসল তৈরির কাজেও অগ্রগতি হচ্ছে। কৃষি-বিজ্ঞানের এসব গবেষণা পৃথিবীকে আজ শস্যে ও ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পৃথিবীর মানুষের জন্য এখন যতটা ফসল দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল পৃথিবীতে ফলছে। জমিকে উর্বর করতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সার। পুরানো প্রযুক্তির লাঙল-মই প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্রাক্টর। উদ্ভাবিত হয়েছে উন্নত জাতের বীজ ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত। এতে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফসল ও বীজ উৎপাদন এবং তা সংরক্ষণেও বিজ্ঞান সহযোগিতা করছে। সেচ ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। পশু-পাখি ও মাছের রোগজনিত মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে কৃষি-চিকিৎসার অগ্রগতির কারণে। এভাবে কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষিকাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে।

উন্নত বিশ্বে কৃষি: উন্নত দেশগুলোর কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন মোয়ার (শস্য ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াই যন্ত্র), ফিড গ্রাইন্ডার (পেষক যন্ত্র), ম্যানিউর স্পেডার (সার বিস্তারণ যন্ত্র), মিল্কার (বৈদ্যুতিক দোহন যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে ট্রাক্টরের মাধ্যমে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ করা সম্ভব হয়। একই ট্রাক্টর আবার একসঙ্গে ফসল কাটার যন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশও কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছে।

কৃষি ও বাংলাদেশ: কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৮ শতাংশ আসে কৃষি থেকে এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ১৪ শতাংশ আসে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে। এছাড়া কর্মসংস্থান ও শিল্পের ভিত্তি হিসেবেও বাংলাদেশে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু কৃষিকাজের জন্য খুবই অনুকূল। এদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক জল-ভাণ্ডার। আধুনিক প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলোর মাটির অনুর্বরতাকে এবং পানির দুর্লভতাকে যেভাবে দূর করেছে, তাতে আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি সুবিধা নিয়ে আসবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। ফলে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখানে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়, আবার অনেক সময়ে প্রত্যাশার তুলনায় কম ফসল ফলে। কৃষকের কাছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৃষি-বিজ্ঞানের জ্ঞান সঠিকভাবে পৌঁছে না দিতে পারাই এর প্রধান কারণ। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব বাধা দূর করা যায় এবং উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশকেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায়।

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা: কৃষির উন্নতির উপরেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইতিমধ্যে বহু নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ফসল উদ্ভাবন করেছে, বহু কৃষিবান্ধব প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে এবং বহু ধরনের কৃষিপণ্যকে বাজারজাত করণের ব্যাপারে নতুন নতুন কৌশল বের করেছে। অর্থাৎ কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ কোনোক্রমে পিছিয়ে নেই। তবে এখন প্রয়োজন এসব উদ্ভাবনকে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করে তোলা এবং কৃষককে এসব উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। শিক্ষিত জনবলকে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারলে এবং কৃষিকাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে পারলে এই কাজ অনেকটা সহজ হয়। তাতে আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কৃষকদেরকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

উপসংহার: কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দিন দিন মজবুত হচ্ছে। বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে টেকসই করতে প্রয়োজন কৃষি সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহজলভ্য করা। এছাড়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ফসলহানির আশঙ্কা তৈরি না হয় অথবা উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যান্য শাখাকেও কৃষির স্বার্থে এগিয়ে আসা দরকার। তবে সবার আগে দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিপেশায় আকৃষ্ট করা এবং শিক্ষিত জনশক্তিকে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত করা। কেননা শিক্ষিত জনশক্তি কৃষিকাজে এগিয়ে এলে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে। এজন্য সরকারের উচিত কৃষিপেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, বিশেষভাবে কৃষিকাজে সফল হওয়া ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা ও সম্মানিত করা। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোক কৃষিপেশায় আকৃষ্ট হবে। কৃষিকাজের সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্পর্ক মজবুত করতে এমন পরিবেশই জরুরি।

মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার

ভূমিকা: বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি এক ভয়বাহ বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। অপার সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য মাদকাসক্তি এখন এক মরণফাঁদ। এই ঘাতক ব্যাধিতে আসক্ত হবার ফলে সমাজ হচ্ছে কলুষিত এবং দেশ, জাতি ও পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক পরিণতি। তাই একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য, আলোকিত আগামীর জন্য মাদকাসক্তির মতো মরণথাবা থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করা একটি অবশ্যকর্তব্য বিষয়।

মাদক ও মাদকাসক্তি: মাদকদ্রব্য হলো প্রাকৃতিকভাবে অথবা রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন পদার্থ যা নেশা তৈরি করে। এসব পদার্থ যারা সেবন করে তাদেরকে মাদকাসক্ত বলা হয়। মাদক সেবনের উগ্র আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি এমন এক নেশা যাতে একবার জড়িয়ে পড়লে, তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। এর পরিণতি অকালমৃত্যু। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য রয়েছে। কিছু কিছু মাদকদ্রব্য ব্যথানাশক ও চেতনানাশক হিসেবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মাদকই নেশাকারী পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিগারেট, মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন, কোকেন, চরস, পপি, মারিজুয়ানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মাদক। এগুলোর বেচা-কেনা বাংলাদেশে অবৈধ। তা সত্ত্বেও গোপনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর কেনা-বেচা চলে। তরুণ সমাজের বড়ো একটি অংশ এসব মাদক গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠে।

মাদকের উৎস: মাদকের উৎস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদক উৎপাদিত হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি অসাধু মুনাফালোভী বিশাল চক্র। মাদকের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, চোরাচালানও হয় অনেক দেশে। থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস (গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল), আফগানিস্তান-ইরান-পাকিস্তান (গোল্ডেন ক্রিসেন্ট) মাদক চোরাচালানের প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। মাদকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো আফিম। পপি নামক উদ্ভিদ থেকে আফিম তৈরি হয়। আফিম থেকে তৈরি হয় 'মরফিন বেস'। মরফিন বেস থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হেরোইন। ব্রাজিল, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডোর প্রভৃতি দেশে মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের বড়ো একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মাদকাসক্তির কারণ: জীবনের হতাশা ও দুঃখবোধ থেকে সাময়িক স্বস্তি লাভের আশায় মানুষ প্রথমবার মাদক গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। অনেকে অন্যের প্ররোচনায় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। অনেকে কৌতূহলবশতও প্রথমবার মাদক গ্রহণ করে থাকে। তবে যেভাবেই হোক, কেউ একবার মাদক গ্রহণ করলে সেই আসক্তি থেকে বের হওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়। সেই সুযোগে বিপথগামী কিছু মানুষ এবং বহুজাতিক মাদক সংস্থাগুলো অবৈধ অর্থের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

পাশ্চাত্যের মাদক উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে ব্যবসা করতে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। করিডোর হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য অনেকটা সহজলভ্য। এই সুযোগে কিছু অসাধু লোক এখানেও একটি মাদকের বাজার সৃষ্টি করেছে। এইসব খারাপ লোকের চেষ্টায় বর্তমান বাংলাদেশে মাদকাসক্ত লোকের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে।

মাদকাসক্তির কুফল: মাদকে আসক্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি কমে যায়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, দেহের ওজন কমতে থাকে, হাসি-কান্নার বোধ ও বিচারবুদ্ধি থাকে না; এক পর্যায়ে সে জীবন্মৃত অবস্থায় পৌঁছে যায়। মাদকের মূল্য বেশি হওয়ায় খুব অল্প দিনেই মাদকাসক্তের সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে যায়। তখন তারা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ক্রমে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা এভাবে নিজেদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এদের নৈতিক অধঃপতন সমাজের অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে গোটা সমাজেই পচন ধরতে শুরু করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহের কারণ হয়। অশান্তির জের ধরে বহু মাদকাসক্ত এক পর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পরিবার ও সমাজের জন্য সেই ক্ষতি অপূরণীয়। এছাড়া সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো, মাদকাসক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী লোক বেশি। অথচ দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই বয়সী লোক সবচেয়ে উপযুক্ত। আবার এই বয়সের নারীরাই সবচেয়ে বেশি প্রজননক্ষম। তাই এই বয়সের নারী-পুরুষ মাদকাসক্ত হওয়ার অর্থ হলো, একদিকে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা, অন্যদিকে সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা।

মাদকাসক্তির প্রতিকার: মাদকাসক্তির সর্বনাশা প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সকলেই ভাবছেন, কেমন করে এর করাল গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়। ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করছে। বাংলাদেশেও মাদকবিরোধী একাধিক সংগঠন কাজ করছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে মাদক গ্রহণ ও বিস্তার প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা লক্ষ করা যায়। সরকারের সমাজসেবা কর্মসূচিতে মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু আছে এবং এদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাদকের হাত থেকে দেশের যুবসমাজকে বাঁচাতে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সেখানে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা। অন্তত বেকারত্বের হতাশা থেকে যেসব মাদকাসক্তির ঘটনা ঘটে, এর ফলে তা দূর হবে। তবে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানকে নির্মূল করা। এজন্য দরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখে কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং তা প্রয়োগ করে দেখানো।

উপসংহার: মাদকাসক্তির কারণে সমাজের কোনো এক জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি হলে, সেই অশান্তি গোটা সমাজকে গ্রাস করতে পারে। তাই মাদকাসক্তিকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় মনে করলে চলবে না। যে তরুণ সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ, তারা যদি সুস্থতার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়, তাহলেই তারা সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে, অন্যথায় নয়। তাই মাদকের করালগ্রাস থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ভূমিকা: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে এমন কিছু দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়কে বোঝায়, যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে এবং যার পিছনে মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রতি বছর এখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, যার মধ্যে আছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা হচ্ছে।

বন্যা: বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলোতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং ফসলের ক্ষতি হয়। বন্যার ফলে জনপদের ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নষ্ট হয়। বহু গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায়। ১৯৫৫ ও ১৯৬৪ সালের বন্যায় বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৭০ ও ১৯৭৪ সালের বন্যার বিভীষিকাও মানুষের মনে দাগ কেটে আছে। ১৯৮৮ সালের বন্যা রাজধানী ঢাকাসহ পুরো দেশের মানুষকে বন্দী করে দেয়। ১৯৯৮ সালের বন্যাও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। এ সময়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় পাঁচ মাস পানিবন্দী জীবন যাপন করেছে লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষ। ২০০১, ২০০২ ও ২০০৭ সালের বন্যাতেও মানুষ, গবাদিপশু ও ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: বছরের এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে বাংলাদেশে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা থাকে খুব বেশি। এর ফলে কখনো কখনো সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। এ-ধরনের দুর্যোগ প্রায় প্রতিবছরই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি উপকূলবর্তী এলাকায় ও দ্বীপসমূহে আঘাত হানে। এর নিষ্ঠুর আঘাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আশ্রয়হীন হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিপন্ন হয় মানুষ, নিসর্গ, ও জীববৈচিত্র্য; বিপর্যস্ত হয় লোকালয়। মানুষ পতিত হয় অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায়। লবণাক্ততার জন্য প্লাবিত এলাকার ভূমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফসলের ক্ষয়ক্ষতির কারণে কৃষি-উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৭০ সালে মেঘনা নদীর মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন এই দুই ঘূর্ণিঝড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরেও অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়।

খরা: দেশের উত্তরাঞ্চলে খরা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অনাবৃষ্টি এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফসলের ক্ষেত, এমনকি গাছপালাও পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পরে রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের কিছু অঞ্চলে খরাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনো উত্তরাঞ্চলের বহু জেলায় খরা পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অত্যধিক তাপদাহে নানা রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে মানুষের ও পশুপাখির কষ্ট হয়।

নদী-ভাঙন: নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুকে ছোটো-বড়ো বহু নদী প্রবহমান। নদীর ধর্মই হলো এক কূল ভাঙা আর অন্য কূল গড়া। নদীর এই ভাঙা-গড়ার খেলায় এ দেশের কত মানুষকে যে বাস্তুচ্যুত হতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। নদীর তীরে বাস-করা মানুষের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই দুর্যোগের কবলে পড়ে মানুষ উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করে এবং কিছু কালের জন্য হলেও হয়ে পড়ে ঠিকানাবিহীন।

ভূমিধস ও ভূমিক্ষয়: ভূমিধস বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট প্রভৃতি পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ের গায়ে অপরিকল্পিতভাবে গৃহ নির্মাণের কারণে ভূমিধসে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। প্রবল বায়ুপ্রবাহ, অধিক বৃষ্টিপাত, নির্বিচারে পাহাড় কাটা ভূমিধসের মূল কারণ। এই ধরনের আর একটি দুর্যোগের নাম ভূমিক্ষয়। ভূমিক্ষয়ের কারণে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি হয় না বটে, তবে তা দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের ক্ষতির কারণ হয়। ভূমিক্ষয়ের মূল কারণ অপরিকল্পিতভাবে বনের গাছ কেটে ফেলা। মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচায় গাছ; এই গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রবল বর্ষণে মাটির উপরের স্তর ক্ষয়ে যায়। এতে ভূমির উচ্চতাই শুধু কমে, তাই নয়, জমির উর্বরতাও নষ্ট হয়।

ভূমিকম্প: অন্যান্য দুর্যোগের মতো ভূমিকম্পও বাংলাদেশে মাঝে মাঝে আঘাত হানে। ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়ে গেলে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ে। তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। গত একশো বছরে বাংলাদেশে মারাত্মক কোনো ভূমিকম্প হয়নি। তবে অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে যে কোনো সাধারণ ভূমিকম্পেও ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বড়ো বড়ো শহর মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।

দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রতিকার: দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার সব সময়েই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নামে সরকারের একটি সংস্থা রয়েছে। প্রচার মাধ্যমগুলোও দুর্যোগকালের পূর্বপ্রস্তুতি ও সম্ভাব্য মোকাবিলার বিষয়টি দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত প্রচারের ব্যবস্থা করে। দুর্যোগের আগে ও পরে সরকারের সবগুলো সংস্থা সতর্ক থাকে, যাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথাসাধ্য কমিয়ে রাখা যায়।

উপসংহার: এক সময়ে মানুষ প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর নিজেদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো। কিন্তু মানুষ এখন ক্রমান্বয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ভূমিকম্পের আগামবার্তা এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব না হলেও ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে মানুষ এখন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগের আগাম খবর পায়। অচিরে হয়তো ভূমিকম্পের আগাম বার্তাও পেয়ে যাবে। হয়তো সেদিন আর দূরে নয়, যখন প্রকৃতির যাবতীয় দুর্যোগকে মানুষ তার প্রযুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

বিশ্বকোষ

ভূমিকা: বিশ্বকোষ হলো কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থমালা, যেখানে জ্ঞানের সকল শাখার নানাবিধ বিষয়ে লেখা সংকলিত থাকে। লেখাগুলো নিবন্ধ আকারে সংশ্লিষ্ট ভাষার বর্ণানুক্রমে কিংবা বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত থাকে। পৃথিবীর সকল জ্ঞানশাখা বা শৃঙ্খলার বিষয়াবলি এতে স্থান পায়। তবে এমন বিশ্বকোষও রয়েছে যাতে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখার বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত নিবন্ধ সজ্জিত থাকে। যেমন – আইনকোষ, অর্থনীতিকোষ ইত্যাদি। বাংলায় বিশ্বকোষ শব্দটি ইংরেজি 'এনসাইক্লোপিডিয়া' শব্দের প্রতিশব্দ। একটি বিশ্বকোষ সংকলনে যুক্ত থাকেন নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের রচিত নিবন্ধগুলো তাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। বিশ্বকোষে সংকলিত নিবন্ধগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও সেগুলো একেকটি বিষয়ের উপর গভীর ধারণা দেয়। বর্তমানে বিশ্বকোষের মুদ্রিত রূপ ছাড়াও কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য রূপও পাওয়া যায়।

বিশ্বকোষের বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি বিশ্বকোষের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, বিশ্বকোষের ভুক্তিগুলো সুবিন্যস্ত হতে হয়, যাতে পাঠক দ্রুত এবং অল্প আয়াসে কোনো বিষয়ের তথ্য খুঁজে পায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশের কারণে এটি আয়তনে বৃহৎ হয়ে থাকে। কখনো অনেকগুলো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়ত, বিশ্বকোষের তথ্যাদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কারণ, নির্ভরযোগ্যতা বিশ্বকোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। চতুর্থত, পরিবর্তিত তথ্যের আলোকে বিশ্বকোষকে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হয়। তাই বিশ্বকোষের কাজকে কখনো সমাপ্ত বলে ভাবা যায় না।

বিশ্বকোষের প্রকারভেদ: বেশ কয়েক রকমের বিশ্বকোষ দেখা যায়। বিষয়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে বিশ্বকোষ দুই ধরনের: ১. সাধারণ বিশ্বকোষ। ২. বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ। প্রকাশের মাধ্যম বিবেচনায় বিশ্বকোষ দুই ধরনের: ১. মুদ্রিত ও ২. ডিজিটাল। প্রতিষ্ঠানের অধীনে নির্ধারিত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ছাড়াও এক ধরনের বিশ্বকোষ রয়েছে যা স্বেচ্ছাসেবী লেখকরা সংকলন করেন। নিচে কয়েক ধরনের বিশ্বকোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক. সাধারণ বিশ্বকোষ: এ ধরনের বিশ্বকোষে বিষয়ের ব্যাপকতা দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এই বিশ্বকোষের ভুক্তিতে কাজ করেন। তাঁদের লেখা নাতিদীর্ঘ নিবন্ধের মাধ্যমে একেকটি বিষয়ের আলোচনা বা তথ্য তুলে ধরা হয়। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

খ. বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণ বিশ্বকোষে প্রদত্ত বর্ণনা ছাড়াও আরো গভীর ধারণা পেতে বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ ব্যবহার করতে হয়। বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষগুলো কেবল ওই বিষয়সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। 'আইনকোষ', 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকস' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

গ. বৈদ্যুতিন বিশ্বকোষ বা ডিজিটাল বিশ্বকোষ: প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে অনেকেই মুদ্রিত বিশ্বকোষের পরিবর্তে কম্পিউটার বা মুঠোফোনে বিশ্বকোষ ব্যবহার করছে। এগুলোকে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল বিশ্বকোষ বলা হয়। এ ধরনের বিশ্বকোষ হালনাগাদ রাখা সহজ।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবী লেখকদের বিশ্বকোষ: ইনটারনেটে কিছু বিশ্বকোষ রয়েছে যা স্বেচ্ছাশ্রমে সংকলিত হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্ত হতে স্বেচ্ছাসেবী লেখকগণ অনলাইনে বিশ্বকোষকে সমৃদ্ধ করেন। 'উইকিপিডিয়া' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

বিশ্বকোষের ভুক্তি: বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলোকে বলা হয় ভুক্তি। অভিধানের চেয়ে বিশ্বকোষের ভুক্তি আলাদা হয়ে থাকে। সাধারণ অভিধানে একটি শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, সংজ্ঞা, বাক্যে প্রয়োগ ইত্যাদি থাকে। কিন্তু বিশ্বকোষের ভুক্তিগুলো হয় দীর্ঘ। বর্ণনা এবং ভাবগত বিবেচনায় এর ব্যাপ্তি অভিধানের চেয়ে বেশি। বিষয়ের শিরোনাম সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে রচিত নিবন্ধই বিশ্বকোষের ভুক্তি। ভুক্তির মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী মানচিত্র, সারণি, ছবি, পরিসংখ্যান কিংবা গ্রন্থপঞ্জিও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অধিকাংশ বিশ্বকোষে ভুক্তি রচয়িতার নাম ভুক্তির নিচে সংযুক্ত থাকে।

ভুক্তির মধ্যে কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। এর অর্থ, এই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে আলাদা ভুক্তি রয়েছে। পাঠক প্রয়োজনে সেসব ভুক্তি পাঠ করে নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারেন। অনলাইন বিশ্বকোষে এগুলো আলাদা রঙের হয় এবং তাতে ক্লিক করলে সেই বিষয়ের আলোচনা সামনে চলে আসে।

পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু বিশ্বকোষ: প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বিশ্বকোষের চর্চা হচ্ছে। তবে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন ফরাসি পণ্ডিত Encyclopedia নামে গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন। পৃথিবীময় যে জ্ঞান রয়েছে তা সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করে সমকালীন পাঠক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এর পর ১৭৬৮–১৭৭১ সালে ইংরেজি বিশ্বকোষ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রকাশিত হয়। এটি এখন ৩২ খণ্ডের মুদ্রিত বইয়ে এবং অনলাইনে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা', 'কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া', 'চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া', 'এভরিম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া' ইত্যাদি বিশ্বকোষ অনুসন্ধানী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ: বাংলা ভাষায় জ্ঞানকোষ রচনার প্রথম পদক্ষেপ নেন উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি। তিনি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অবলম্বনে 'বিদ্যাহারাবলী' নামক জ্ঞানকোষ রচনার কাজ শুরু করেন। তবে বাংলা ভাষায় যথার্থ বিশ্বকোষ হলো নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত 'বিশ্বকোষ'। এর প্রথম খণ্ড সংকলন করেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ড থেকে ২২তম খণ্ড পর্যন্ত সংকলন করেন নগেন্দ্রনাথ বসু। এই বিশ্বকোষের কাজ শুরু হয় ১৮৮৬ সালে এবং শেষ হয় ১৯১১ সালে। এছাড়া 'ভারতকোষ' বাংলা ভাষায় সংকলিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষ। এটি ১৮৮১ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক সংকলিত হয়।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। আয়তন, ভুক্তিসমূহের বিন্যাস ও ব্যবহার-যোগ্যতার বিবেচনায় এটি একটি সফল প্রয়াস বলা যায়। নওরোজ কিতাবিস্তান ও মুক্তধারা প্রকাশিত চার খণ্ডে সংকলিত 'বাংলা বিশ্বকোষ' (১৯৭২ থেকে ১৯৭৪) একটি সুপরিকল্পিত বিশ্বকোষ, যদিও এটি 'কলাম্বিয়া ভাইকিং ডেস্ক এনসাইক্লোপিডিয়া' অবলম্বনে রচিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আরো কিছু বাংলা কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'বাংলাপিডিয়া' বাংলাদেশে বিশ্বকোষ চর্চায় এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ। 'বাংলাপিডিয়া' বর্তমানে ১৪ খণ্ডে পাওয়া যায়। এর কম্পিউটারে ব্যবহারের সংস্করণ এবং অনলাইন সংস্করণও রয়েছে।

উপসংহার: বিশ্বের সব শৃঙ্খলার ধারণাসমূহ কোনো ব্যক্তির একার পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়। এমনকি একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখার সব বিষয়ও কারো একার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে এক জায়গায় বিন্যস্ত করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া বিশ্বকোষের প্রধান লক্ষ্য। কোষগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশ্বকোষ শুধু আয়তনেই বড়ো নয়, জ্ঞানচর্চার এক বিপুল ভাণ্ডারও বটে। তাই প্রতিটি ভাষায় বিশ্বকোষ থাকা জরুরি।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

কারও মনে কষ্ট দিও না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।